গ্রন্থপরিচয়

Signature Not Verified
Tito
Digitally signed by Tito
DN: cn=Tito, o=Muktadhara, c=AU
Date: 2004.11.25 12:47:59 + 11'00'

১৯৩৫/

জননী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, যদিও রচনাকালের হিসেবে দ্বিতীয়। যে-উপন্যাসটি তিনি সর্বপ্রথম রচনা করেছিলেন— 'দিবারাত্রির কাব্য', গ্রন্থাকারে সেটি বেরোয় পরে।

'জননী' রচনার ও প্রকাশের ইতিহাস জানার জন্য লেখকের বয়ঃকনিষ্ঠ এক লেখক এবং গুরুজনস্থানীয় এক সম্পাদকের স্মৃতিচারণ প্রণিধানযোগ্য। প্রথম জন ভবানী মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখছেন : "মানিকের 'জননী' উপন্যাসখানি একটি ফুলস্কেপ সাইজের বিরাট খাতায় লেখা ছিল। ছোট অক্ষরে লেখা সেই উপন্যাসটি হাতে করে তাকে অনেক ঘুরতে হয়েছে। জেনারেল পিন্‌টার্সের সুরেশবাবু 'জননী' ছাপবার আগে আর্য পাবলিশিং-এর শশাঙ্ক চৌধুরীর কাছে অনেকদিন রাখা ছিল।" দ্বিতীয় জন সজনীকান্ত দাস, বিখ্যাত ও কুখ্যাত 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক। তিনি জানিয়েছেন : "মানিকের প্রথম গ্রন্থের প্রকাশ সম্বন্ধে যাবতীয় সংকলন-গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে ভুল লেখা হইয়াছে [...] । ১৩৪০ বঙ্গাব্দে নয়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ 'জননী' ছাপিয়া মানিক সর্বপ্রথম গ্রন্থকার-শ্রেণীভুক্ত হন [...]।" এবং তিনি প্রকাশক হিসেবে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের উল্লেখ করেছেন। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২৮৪ এবং মূল্য দু টাকা মাত্র।

আমাদের পরিজ্ঞাত তথ্যের ভিতরে একটি অসঙ্গতি লক্ষ করা যাচ্ছে। একটি ব্যাপার মোটামুটি স্পষ্ট যে প্রকাশক পেতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল। আর্য পাবলিশিং ছাপলে বই আগেই বেরোত। কিন্তু জেনারেল প্রিন্টার্স কি 'জননী' ছেপেছিল? ভবানী মুখোপাধ্যায়ের এই ইঙ্গিতের ('জেনারেল প্রিন্‌টার্সের সুরেশবাবু 'জননী' ছাপবার আগে') সমর্থনে আমরা কোনো তথ্য পাই নি। তাঁর বক্তব্য যথার্থ ধরে নিলে সিদ্ধান্তে আসতে হয়, ১৯৩৫-এর ৭ই মার্চের পূর্বে আরেক বার 'জননী' প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রকাশ করেছিলেন সুরেশবাবু যিনি জেনারেল প্রিন্টার্সের লোক। অবশ্য এই সুরেশবাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। যাই হোক, কি স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি তাঁর অন্যান্য পরিচিত জন বা পরবর্তীকালে গবেষকবৃন্দ— কেউই অন্য কোনো প্রকাশক বা ভিন্ন কোনো প্রকাশতারিখ বিষয়ে কোথাও কিছু বলেন নি।

দিবারাত্রির কাব্য

প্রকাশকাল ১৯৩৫-এর ডিসেম্বর। অর্থাৎ 'জননী' উপন্যাস বেরোবার ন'মাস পরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটিই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম উপন্যাস।

ভবানী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "একদিন তখনকার গ্লোব সিনেমার ওপরতলায় সস্তার টিকিটে তিনটের শোতে ছবি দেখছি, পিছন থেকে কে কাঁধে হাত রাখল, পিছন ফিরে দেখি মানিক। হাতে তার একখানি কালো এক্সারসাইজ বই। সিনেমা ভাঙতে মানিক আমাকে টেনে নিয়ে কার্জন পার্কের একপাশে বসে তার নতুন লেখা পড়ে শোনালো। তখন সেটি একটি গল্প ছিল, কিন্তু পরে বঙ্গশ্রীতে যখন প্রকাশিত হয় তখন সজনীকান্তের উপদেশানুসারে সে আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদ রচনা করে। এবং পরে এই কাহিনীগুলি 'দিবারাত্রির কাব্য' নামে প্রকাশিত হয়।"

সজনীকান্ত দাস কেন এবং কী উপদেশ দিয়েছিলেন তা তাঁর জবানিতেই শোনা যাক : "[...] মানিক 'একটি দিন' নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি [অর্থাৎ দিবারাত্রির কাব্য] উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি 'একটি দিন' সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক 'একটি দিনে'র উপসংহার 'একটি সন্ধ্যা' লইয়া উপস্থিত হইলেন। 'একটি সন্ধ্যা'তেই শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা 'রাত্রি'তে গড়াইল এবং আরো দুই সংখ্যা পরে 'রাত্রি' — 'দিবারাত্রির কাব্য' হইল। এই উপন্যাসের নাম পরিবর্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে। এই উপন্যাসটি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব প্রিয়, কারণ ইহার মধ্যস্থতায় আমি মানিককে জানিয়াছিলাম।"

পুস্তকাকারে 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশ করেছিল ডি.এম. লাইব্রেরী। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২০৪ এবং দাম ছিল এক টাকা বারো আনা।

উপন্যাসের প্রারম্ভে 'লেখকের ভূমিকা' শিরোনাম ছোট্ট একটি রচনা যুক্ত করেছিলেন, এখানে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল :

লেখকের ভূমিকা

> দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর (১৩৪১) বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।
>
> দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক — তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নতুন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতকগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection — মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।

সমস্ত তথ্য একত্র করলে এই সংবাদগুলো মেলে : ১. বর্তমান উপন্যাসের (যা আদি রূপে ছিল গল্প) রচনাকাল মোটামুটি ১৯২৯ (বঙ্গাব্দ ১৩৩৬); ২. 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রে আত্মপ্রকাশ করে পাঁচ বছর পরে, ১৯৩৪ সালে; ৩. গল্পটি পরে ধারাবাহিকতা মেনে ক্রমশ বেড়ে যেতে-যেতে ঐ কাগজেই ছাপা হতে থাকে : 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি' ও 'দিবারাত্রির কাব্য' এই অনুক্রমে অতঃপর ১৩৪১-এর পৌষ পর্যন্ত ছাপা হয়ে কাহিনীটি সমাপ্ত হয় এবং শেষে সবটুকু মিলে সম্পূর্ণ উপন্যাসের অবয়ব নেয় — যেমনটি চেয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস; ৪. গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে বেশি বিলম্ব হয় নি, পরের বছরই ছাপা হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

যুগান্তর চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে পত্রিকায় প্রকাশিত আদি পাঠ 'গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত' হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য একটি পার্থক্য তো প্রথমেই ধরা পড়ে : উপন্যাসাকারে প্রকাশের সময় তিনটি অংশের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত তিনটি কবিতা পত্রিকায় মুদ্রণকালে অনুপস্থিত ছিল।

১৯৩৬/

পুতুলনাচের ইতিকথা

মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৪১ সালের পৌষ সংখ্যা (অর্থাৎ ১৯৩৪-এর ডিসেম্বর কি ১৯৩৫-এর জানুয়ারি) থেকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৯৩৬-এ, প্রকাশ করে ডি. এম. লাইব্রেরী। প্রথম প্রকাশের সময় প্রকাশকাল মুদ্রিত ছিল না, তবে পরে ১৯৩৬ বলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে।

'উপন্যাসের ধারা' নামে একটি প্রবন্ধে ("লেখকের কথা" গ্রন্থে সংকলিত) উপন্যাসটির উদ্ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়লো। কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এল 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র উপকরণ এবং কয়েকদিনে একটি গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাসটি — এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেকদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।"

"পুতুলনাচের ইতিকথা" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস।

পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চতুর্থ উপন্যাসটি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' মাসিক পত্রিকায় ১৯৩৪ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলে স্বভাবতই উপন্যাসটির প্রকাশও স্থগিত হয়ে যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স উপন্যাসটি প্রকাশ করেন ১৯৩৬ সালের ২৮শে মে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২০৮ এবং দাম ছিল দেড় টাকা।

১৯৩৬ সালের শেষ দিকে আরো একটি উপন্যাস বেরিয়েছিল তাঁর : "জীবনের জটিলতা"।

১৯৪১/

অহিংসা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় "অহিংসা" উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৩৯-এর শুরু, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা, থেকে। দু বৎসর ধরে প্রকাশের পর সমাপ্ত হয় ১৩৪৭-এর পৌষ সংখ্যায়।

ডি. এম. লাইব্রেরী "অহিংসা" গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন ১৯৪১ সালে, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। দাম রাখা হয়েছিল আড়াই টাকা।

প্রকাশকালের নিরিখে "অহিংসা" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্টম উপন্যাস এবং যথেষ্ট বিতর্কিত গ্রন্থ। দু বছর পরে প্রকাশিত "প্রতিবিম্ব" উপন্যাসের ভূমিকায় এই উপন্যাস বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে ঔপন্যাসিক যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য : "দেশে অহিংসা নীতিতে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। বইখানার নাম অহিংসা। সুতরাং যদিও বইখানাতে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই, তবু ধরে নিতে হবে অহিংসা আন্দোলনের সঙ্গে কাহিনীর সংস্রব আছে। — 'কি বলতে চাচ্ছেন ঠিক ধরতে পারছি না মানিকবাবু।' —'যা বলি নি তা ধরতে চাইছেন কেন?' প্রশ্নকারী তিন ঘণ্টা ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আমার লেখা বইয়ে আমি কি বলেছি আর কি বলি নি! নীতি বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করেও সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়, এটি তাঁকে কোনমতেই বুঝিয়ে দিতে পারলাম না।"

বস্তুত, "অহিংসা" রাজনৈতিক উপন্যাসই নয়, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

১৯৪৭/

চিহ্ন

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তকে উপজীব্য করে রচিত এ-কাহিনী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্দশতম উপন্যাস। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ — দুটি বৎসর ধরে ভারত জুড়ে যে- রাজনীতিপ্রবাহ বর্তমান ছিল

সজনীকান্ত দাস কেন এবং কী উপদেশ দিয়েছিলেন তা তাঁর জবানিতেই শোনা যাক : "[...] মানিক 'একটি দিন' নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি [অর্থাৎ দিবারাত্রির কাব্য] উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি 'একটি দিন' সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক 'একটি দিনে'র উপসংহার 'একটি সন্ধ্যা' লইয়া উপস্থিত হইলেন। 'একটি সন্ধ্যা'তেই শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা 'রাত্রি'তে গড়াইল এবং আরো দুই সংখ্যা পরে 'রাত্রি' — 'দিবারাত্রির কাব্য' হইল। এই উপন্যাসের নাম পরিবর্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে। এই উপন্যাসটি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব প্রিয়, কারণ ইহার মধ্যস্থতায় আমি মানিককে জানিয়াছিলাম।"

পুস্তকাকারে 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশ করেছিল ডি.এম. লাইব্রেরী। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২০৪ এবং দাম ছিল এক টাকা বারো আনা।

উপন্যাসের প্রারম্ভে 'লেখকের ভূমিকা' শিরোনাম ছোট্ট একটি রচনা যুক্ত করেছিলেন, এখানে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল :

লেখকের ভূমিকা

> দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর (১৩৪১) বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।
>
> দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক — তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নতুন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতকগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection — মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।

সমস্ত তথ্য একত্র করলে এই সংবাদগুলো মেলে : ১. বর্তমান উপন্যাসের (যা আদি রূপে ছিল গল্প) রচনাকাল মোটামুটি ১৯২৯ (বঙ্গাব্দ ১৩৩৬); ২. 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রে আত্মপ্রকাশ করে পাঁচ বছর পরে, ১৯৩৪ সালে; ৩. গল্পটি পরে ধারাবাহিকতা মেনে ক্রমশ বেড়ে যেতে-যেতে ঐ কাগজেই ছাপা হতে থাকে : 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি' ও 'দিবারাত্রির কাব্য' এই অনুক্রমে অতঃপর ১৩৪১-এর পৌষ পর্যন্ত ছাপা হয়ে কাহিনীটি সমাপ্ত হয় এবং শেষে সবটুকু মিলে সম্পূর্ণ উপন্যাসের অবয়ব নেয় — যেমনটি চেয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস; ৪. গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে বেশি বিলম্ব হয় নি, পরের বছরই ছাপা হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

যুগান্তর চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে পত্রিকায় প্রকাশিত আদি পাঠ 'গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত' হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য একটি পার্থক্য তো প্রথমেই ধরা পড়ে : উপন্যাসাকারে প্রকাশের সময় তিনটি অংশের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত তিনটি কবিতা পত্রিকায় মুদ্রণকালে অনুপস্থিত ছিল।

১৯৩৬/

পুতুলনাচের ইতিকথা

মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৪১ সালের পৌষ সংখ্যা (অর্থাৎ ১৯৩৪-এর ডিসেম্বর কি ১৯৩৫-এর জানুয়ারি) থেকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৯৩৬-এ, প্রকাশ করে ডি. এম. লাইব্রেরী। প্রথম প্রকাশের সময় প্রকাশকাল মুদ্রিত ছিল না, তবে পরে ১৯৩৬ বলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে।

'উপন্যাসের ধারা' নামে একটি প্রবন্ধে ("লেখকের কথা" গ্রন্থে সংকলিত) উপন্যাসটির উদ্ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়লো। কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এল 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র উপকরণ এবং কয়েকদিনে একটি গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাসটি — এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেকদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।"

"পুতুলনাচের ইতিকথা" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস।

পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চতুর্থ উপন্যাসটি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' মাসিক পত্রিকায় ১৯৩৪ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলে স্বভাবতই উপন্যাসটির প্রকাশও স্থগিত হয়ে যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স উপন্যাসটি প্রকাশ করেন ১৯৩৬ সালের ২৮শে মে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২০৮ এবং দাম ছিল দেড় টাকা।

১৯৩৬ সালের শেষ দিকে আরো একটি উপন্যাস বেরিয়েছিল তাঁর : "জীবনের জটিলতা"।

১৯৪১/

অহিংসা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় "অহিংসা" উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৩৯-এর শুরু, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা, থেকে। দু বৎসর ধরে প্রকাশের পর সমাপ্ত হয় ১৩৪৭-এর পৌষ সংখ্যায়।

ডি. এম. লাইব্রেরী "অহিংসা" গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন ১৯৪১ সালে, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। দাম রাখা হয়েছিল আড়াই টাকা।

প্রকাশকালের নিরিখে "অহিংসা" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্টম উপন্যাস এবং যথেষ্ট বিতর্কিত গ্রন্থ। দু বছর পরে প্রকাশিত "প্রতিবিম্ব" উপন্যাসের ভূমিকায় এই উপন্যাস বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে ঔপন্যাসিক যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য : "দেশে অহিংসা নীতিতে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। বইখানার নাম অহিংসা। সুতরাং যদিও বইখানাতে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই, তবু ধরে নিতে হবে অহিংসা আন্দোলনের সঙ্গে কাহিনীর সংস্রব আছে। — 'কি বলতে চাচ্ছেন ঠিক ধরতে পারছি না মানিকবাবু।' —'যা বলি নি তা ধরতে চাইছেন কেন?' প্রশ্নকারী তিন ঘণ্টা ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আমার লেখা বইয়ে আমি কি বলেছি আর কি বলি নি! নীতি বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করেও সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়, এটি তাঁকে কোনমতেই বুঝিয়ে দিতে পারলাম না।"

বস্তুত, "অহিংসা" রাজনৈতিক উপন্যাসই নয়, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

১৯৪৭/

চিহ্ন

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তকে উপজীব্য করে রচিত এ-কাহিনী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্দশতম উপন্যাস। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ — দুটি বৎসর ধরে ভারত জুড়ে যে- রাজনীতিপ্রবাহ বর্তমান ছিল

তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজগতির ধারা উন্মোচনের লক্ষ্যে এর জন্ম। কাহিনীর প্রত্যক্ষ বাস্তব ভিত্তি ছিল রশিদ আলি দিবস উপলক্ষে পুলিশের নৃশংসতা।

"চিহ্ন" উপন্যাস 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে বেরোয় বসুমতী সাহিত্যমন্দির থেকে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৯৬ এবং মূল্য তিন টাকা।

"লেখকের কথা" সংযুক্ত হয়েছিল গ্রন্থের প্রারম্ভে : "চিহ্ন বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু সংশোধন পরিবর্তন করেছি। বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কি না আমার জানা নেই। এই ধরনের কাহিনী যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি। মাঘ, ১৩৫৩।"

১৯৪৮/

চতুষ্কোণ

"চতুষ্কোণ" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষোড়শতম উপন্যাস। ডি. এম. লাইব্রেরী ১৯৪৮ সালে প্রকাশ করেন। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৫ এবং দাম রাখা হয়েছিল দু টাকা।

উপন্যাসের "ভূমিকা"য় লেখকের একটি কৈফিয়ৎ আছে : "রাজকুমারের মত অসংখ্য ছেলে দেখেছি। তারা নানা রকম, কিন্তু আসলে এক। রাজকুমারকে 'টাইপ' বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এই 'অনেক' যারা, তাদের মধ্যে মূলগত মিল আছে, তাই এটা সম্ভব হল। রাজকুমার একটু বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে কি? আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল।"

১৯৫৬/

হলুদ নদী সবুজ বন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর বৎসর (১৯৫৬) প্রকাশিত প্রথম, এবং কালানুক্রমিকতায় ৩২-সংখ্যক, উপন্যাস; অবশ্য "সহরতলী" এবং "সোনার চেয়ে দামী" উপন্যাসদ্বয়ের দ্বিতীয় খণ্ড দু'টি হিসেবে ধরলে ৩৪-তম গ্রন্থ বলতে হবে। প্রকাশ করেছিল নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে (১৩৬২-র মাঘ মাসে)। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২৬৮, দাম চার টাকা।

উপন্যাসের শুরুতে ভূমিকারূপে এই নাতিদীর্ঘ রচনা সংযোজিত হয়েছিল :

লেখকের কথা

উপন্যাসে ভূমিকার বালাই জুড়ে দেওয়া আমি পছন্দ করি না। কবিতা গল্প উপন্যাসের আগাগোড়া সবটাই লেখকের ভূমিকা— সেই সঙ্গে আবার শুধু নিয়মরক্ষার জন্য লেখকের ব্যক্তিগত খানিকটা বক্তব্য যোগ করা ছেলেমানুষি ছাড়া কিছুই নয়।

তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয়ে পাঠকসমাজে কৈফিয়ৎ পেশ করা লেখকের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য হয়েও দাঁড়ায়। ক্ষমা-ভিক্ষা নয়, বইয়ের গোড়ায় পাঠক-সমালোচকের ক্ষমা চেয়ে রাখাও সাধারণ নিয়মে ছ্যাবলামির মতো বিশ্রী অপরাধ।

হলুদ নদী সবুজ বন আট দশ মাস আগে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।
আমার শরীর খারাপ, এই দোষে বইটা এতদিন আটক হয়েছিল।
দোষ আমার।
প্রকাশকের সহযোগিতায় কোনো ত্রুটি ঘটেনি।

প রি শি ষ্ট : দু ই

আবদুল মান্নান সৈয়দ

জীবনপঞ্জি

জন্ম

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫; ১৯শে মে ১৯০৮। স্থান : সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস : বিক্রমপুর ঢাকা। পিতৃদত্ত নাম : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম : মানিক। পিতা : হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। (মৃত্যু ১৯৫৮ — মানিকের মৃত্যুর বছর দুয়েক পরে)। মাতা— নীরদা দেবী (মৃত্যু ১৯২৪ — টাঙ্গাইলে)। পিতামাতার ১৪ সন্তানের মধ্যে পঞ্চম পুত্র মানিক। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত আত্মজীবনী পাওয়া গেছে। পিতা সেটেলমেণ্ট বিভাগের কানুনগো এবং পরে সাবডেপুটি কালেক্টার। পিতার চাকরিসূত্রে মানিক পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ছিলেন।

শিক্ষা

কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষারম্ভ। পরে পড়েন বিভিন্ন স্কুলে— টাঙ্গাইলে, কাঁথি মডেল হাইস্কুলে, মেদিনীপুর জেলা স্কুলে। মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯২৬)। তারপর বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন থেকে প্রথম বিভাগে আই.এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২৮)। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি.এস-সি. ক্লাসে ভর্তি। কিন্তু ততদিনে সাহিত্যচর্চার নেশা জমে উঠেছে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দেই লেখক হিশেবে আত্মপ্রকাশ — 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'অতসী মামী' নামক গল্প প্রকাশিত (পৌষ ১৩৩৫)। ফলে বি. এস-সি. পরীক্ষায় দু বারই অকৃতকার্য হন (১৯৩১-৩২)। সাহিত্যকর্মে এমনভাবেই লিপ্ত হয়ে পড়েন যে একাডেমিক শিক্ষার ইতি ওখানেই ঘটে।

কর্ম

সাহিত্যই ছিল মানিকের উপার্জনের উপায়। দু একবার সাহিত্যসম্পৃক্ত দু একটি কর্ম থেকে জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করেন। ১৯৩৪ সালে কয়েক মাস ১০/ বি পঞ্চানন ঘোষ লেন থেকে প্রকাশিত 'নবারুণ' পত্রিকার সম্পাদক হিশেবে কাজ করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন (তৎকালীন সম্পাদক : কিরণকুমার রায়)। ১৯৩৯ সালে অনুজ সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস' নামে প্রেস ও প্রকাশনসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই মানিকের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ "বৌ" প্রথম প্রকাশিত হয়— প্রথম সংস্করণে (১৯৪০) আটটি গল্প ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৬) যুক্ত হয় আরো পাঁচটি গল্প। প্রেস চালাতে পারেন নি। ১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের পাবলিসিটি এ্যাসিসট্যান্ট পদে কয়েক মাস অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেখাই ছিল মানিকের মূল পেশা।

বিবাহ

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। চার পুত্র-কন্যা : শান্তা ভট্টাচার্য, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা চক্রবর্তী ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় উপন্যাস–গল্প–নাটক–গ্রন্থাবলি মিলিয়ে **৫৬টি** গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম গ্রন্থ "জননী" উপন্যাস, ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত; সর্বশেষ গ্রন্থ, "মাশুল" উপন্যাস, ১৯৫৬ সালে, মৃত্যুর এক মাস আগে প্রকাশিত। মানিকের মৃত্যুর পরে তাঁর উপন্যাস–গল্প–কবিতা–প্রবন্ধ–রচনাবলি মিলিয়ে অন্তত ২৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তেরো খণ্ডে প্রকাশিত "মানিক গ্রন্থাবলী" (১৯৬৩–৭৬)। এই গ্রন্থাবলির বাইরেও মানিকের বহু অগ্রন্থিত রচনা পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে আজও।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনা — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সমকালীন সব ধরনের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে— 'বিচিত্রা', 'বঙ্গশ্রী', 'পূর্বাশা', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'সত্যযুগ', 'প্রবাসী', 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'নবশ্রী', 'নতুন জীবন', 'বসুমতী', 'গল্পভারতী', 'মৌচাক', 'পাঠশালা', 'রংমশাল', 'নবশক্তি', 'স্বাধীনতা', 'আগামী', 'কালান্তর', 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য', 'দিগন্ত', 'সংস্কৃতি', '[illegible]', 'প্রভাতী', 'অনন্যা', 'উল্টোরথ', 'এলোমেলো' প্রভৃতি।

অসুস্থতা — ১৯৩৫ সালে, যে–বছর মানিক গ্রন্থকার হিশেবে প্রথম আবির্ভূত হন, সে–বছরই আক্রান্ত হন মৃগী রোগে। এই রোগ তাঁর মৃত্যুকাল অবধি সঙ্গী ছিল। তাঁর ডায়েরিতে এই রোগ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতেন মানিক।

কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান — ১৯৪৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তাঁর লেখায় একটি বিশাল পরিবর্তন সূচিত হয়।

আধ্যাত্মিকতা–ধার্মিকতা — কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ঠিক দশ বছর পরে, ১৯৫৪ সালে, মানিকের ডায়েরিতে আধ্যাত্মিকতার সূচনা হয় : 'কোনো প্রতীক অবলম্বন না করলে প্রণামের সময় মন বিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে প্রতীক প্রতীক— মা কে বা কেমন জানি না।' (২৮–৪–৫৪) লেখায় অবশ্য আধ্যাত্মিকতার দাগ পড়ে নি কখনো। হয়তো মাত্র ৪৮ বছর বয়সে অকালপ্রয়াণ না করলে রচনায় আধ্যাত্মিকতার স্বাক্ষর পড়ত।

শেষ জীবন ও মৃত্যু — লেখাই ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল উপজীবিকা। ফলত, দারিদ্র্য ছিল তাঁর চিরসঙ্গী। ক্রমাগত বিশ্লেষণাত্মক গল্প–উপন্যাস রচনা, অসুখ, অর্থাভাব, সামাজিক–রাজনৈতিক ক্লিষ্টতা মানিককে বিপর্যস্ত করে দেয়— হয়তো সে-সব বিস্মরণের জন্যেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, যা থেকে— অনেক চেষ্টা করেও — শেষপর্যন্ত মুক্তি পান নি। নির্জনস্বভাব, বন্ধুহীন, একাকী মানুষ ছিলেন মানিক। তাঁর কোনো গ্রন্থ কোনো প্রিয়জনকে উৎসর্গ করেন নি মানিক। একটিমাত্র উৎসর্গ "স্বাধীনতার স্বাদ" (১৯৫১) উপন্যাসের, উৎসর্গপত্রটিও মানিকের রচনার মতোই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর : 'সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম— জনসাধারণই মানবতার প্রতীক'। ১৯৫৬ সালের ৩০শে নভেম্বর মানিক অজ্ঞান হয়ে যান, ২রা ডিসেম্বর নীত হন নীলরতন সরকার হাসপাতালে, ৩রা ডিসেম্বর মৃত্যু।

মৃত্যুত্তর শ্রদ্ধার্ঘ্য — ৭ই ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে বিশাল শোকসভা। 'অগ্রণী', 'নতুন সাহিত্য' ও 'পরিচয়'— এই তিনটি পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

গ্রন্থপঞ্জি

উপন্যাস

১। জননী (১৯৩৫)
২। দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫)
৩। পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)
৪। পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬)
৫। জীবনের জটিলতা (১৯৩৬)
৬। অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮)
৭। সহরতলী (প্রথম পর্ব) (১৯৪০)
৮। সহরতলী (দ্বিতীয় পর্ব) (১৯৪১)
৯। অহিংসা (১৯৪১)
১০। ধরাবাঁধা জীবন (১৯৪১)
১১। চতুষ্কোণ (১৯৪২)
১২। প্রতিবিম্ব (১৯৪৩)
১৩। দর্পণ (১৯৪৫)
১৪। সহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬)
১৫। চিন্তামণি (১৯৪৬)
১৬। চিহ্ন (১৯৪৭)
১৭। আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭)
১৮। জীয়ন্ত (১৯৫০)
১৯। পেশা (১৯৫১)
২০। সোনার চেয়ে দামী (প্রথম খণ্ড) (১৯৫১)
২১। স্বাধীনতার স্বাদ[১] (১৯৫১)
২২। সোনার চেয়ে দামী (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯৫২)
২৩। ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২)
২৪। পাশাপাশি (১৯৫২)
২৫। সার্বজনীন (১৯৫২)
২৬। নাগপাশ (১৯৫৩)
২৭। ফেরিওয়ালা (১৯৫৩)
২৮। আরোগ্য (১৯৫৩)
২৯। চালচলন (১৯৫৩)
৩০। তেইশ বছর আগে পরে (১৯৫৩)
৩১। হরফ (১৯৫৪)
৩২। শুভাশুভ (১৯৫৪)
৩৩। পরাধীন প্রেম (১৯৫৫)
৩৪। হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)
৩৫। মাশুল (১৯৫৬)

মরণোত্তর প্রকাশ

৩৬। প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান (১৯৫৬)

৩৭। মাটি-ঘেঁষা মানুষ[২] (১৯৫৭)
৩৮। মাঝির ছেলে[৩] (১৯৫৯)
৩৯। শান্তিলতা (১৯৬০)
৪০। মাটির কাছের কিশোর কবি[৪]
৪১। মশাল[৫]

ছোটগল্প

১। অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫)
২। প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)
৩। মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮)
৪। সরীসৃপ (১৯৩৯)
৫। বৌ (১৯৪০)
৬। সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩)
৭। ভেজাল (১৯৪৪)
৮। হলুদপোড়া (১৯৪৫)
৯। আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬)
১০। পরিস্থিতি (১৯৪৬)
১১। খতিয়ান (১৯৪৭)
১২। মাটির মাশুল (১৯৪৮)
১৩। ছোট বড় (১৯৪৮)
১৪। ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)
১৫। ফেরিওলা (১৯৫৩)
১৬। লাজুকলতা (১৯৫৪)

নাটক

১। ভিটেমাটি (১৯৪৬)

প্রবন্ধ

১। লেখকের কথা (১৯৫৭)

কবিতা

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৭০)

রচনা সংকলন

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০)
২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৫৬)
৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প–সঞ্চয়ন (১৯৫৭)
৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৮)
৫। উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ (১৯৬৩)
৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প [নতুন সম্পাদনা] (১৯৬৫)
৭। কিশোর বিচিত্রা (১৯৬৮)
৮। চারটি উপন্যাস (১৯৭১)

রচনাসংগ্রহ

১। মানিক-গ্রন্থাবলী : প্রথম ভাগ (১৯৫০)
২। মানিক-গ্রন্থাবলী : দ্বিতীয় ভাগ (১৯৫২)
৩। মানিক গ্রন্থাবলী : প্রথম খণ্ড (১৯৬৩)
৪। মানিক গ্রন্থাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৭)
৫। মানিক গ্রন্থাবলী : তৃতীয় খণ্ড (১৯৭০)
৬। মানিক গ্রন্থাবলী : চতুর্থ খণ্ড (১৯৭০)
৭। মানিক গ্রন্থাবলী : পঞ্চম খণ্ড (১৯৭১)
৮। মানিক গ্রন্থাবলী : ষষ্ঠ খণ্ড (১৯৭১)
৯। মানিক গ্রন্থাবলী : সপ্তম খণ্ড (১৯৭২)
১০। মানিক গ্রন্থাবলী : অষ্টম খণ্ড (১৯৭৩)
১১। মানিক গ্রন্থাবলী : নবম খণ্ড (১৯৭৩)
১২। মানিক গ্রন্থাবলী : দশম খণ্ড (১৯৭৩)
১৩। মানিক গ্রন্থাবলী : একাদশ খণ্ড (১৯৭৪)
১৪। মানিক গ্রন্থাবলী : দ্বাদশ খণ্ড (১৯৭৫)
১৫। মানিক গ্রন্থাবলী : ত্রয়োদশ খণ্ড (১৯৭৬)
১৬। অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [যুগান্তর চক্রবর্তী–সম্পাদিত] (১৯৭৬)

---

১. 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশকালে উপন্যাসটির নাম ছিলো 'নগরবাসী'। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে লেখক নাম পরিবর্তন করেন।
২. উপন্যাসটি লেখকের অকালমৃত্যুর ফলে অসম্পূর্ণ থাকে। সম্পূর্ণ করেন কথাসাহিত্যিক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
৩. কিশোর–উপন্যাস।
৪. অসম্পূর্ণ কিশোর–উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেন শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
৫. অসম্পূর্ণ কিশোর–উপন্যাস।